Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উজানে মৃত্যু

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জীনাত ইমতিয়াজ আলী
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.8
Pages	147-154
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *উজানে মৃত্যু*

জীনাত ইমতিয়াজ আলী

গভীর স্বজাতি নিষ্ঠা, এ দেশীয় সমাজসংগঠন ও সমাজবিকাশ সম্পর্কিত অখণ্ড ধারণা, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা–সূত্রে অর্জিত পাশ্চাত্য–সমাজবোধ এবং ধনবাদী সমাজ–শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের নৈঃসঙ্গ্য, শূন্যতা ও যন্ত্রণাকে আত্মস্থকরণ ও প্রকাশবৈচিত্র্যের মাঝেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রাণচঞ্চল শিল্পিসত্তার মৌল পরিচয়। পারিবারিক বৃত্তে নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের ফলে তিনি স্বদেশের মৃত্তিকামূলে স্বাভাবিকভাবে শিকড়সঞ্চারী হতে পারেননি। উত্তর-যৌবনে চাকরি-সূত্রে স্বদেশ ও স্বজন থেকে বিযুক্ত হয়ে প্রবাসে অবস্থানের ফলে তাঁর শূন্যতাবোধ হয়েছে আরও গভীর ও প্রগাঢ়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্মে যে–সব অনিকেত চরিত্রের সন্ধান মেলে তাদের সেই বিচ্ছিন্ন চেতনার উৎস তাঁর জীবন–বাস্তবতা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতে, মানুষ মূলত বিচ্ছিন্ন এবং শিল্পবিপ্লব ও মহাযুদ্ধ–পরবর্তীকালে মানুষের এই কেন্দ্রবিমুখি অনুভূতি হয়েছে আরও প্রবল। কিন্তু নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার মধ্যে তিনি সার্থকতা খোঁজেননি। সমাজের জ্ঞানবান ও প্রাজ্ঞ প্রতিনিধি হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁর শিল্পী–চৈতন্যের সার্থকতা। ইয়োরোপীয় অস্তিত্ববাদী দর্শন তাঁর এই স্বাতিক্রমণ প্রচেষ্টাকে দিয়েছে তাত্ত্বিক এক স্বতন্ত্র প্রেরণা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতের তিন উজ্জ্বল এলাকা তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক। অন্যকথায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রথমে গল্পকার, মধ্যপর্বে ঔপন্যাসিক এবং অন্তিম পর্যায়ে নাট্যকার।

২

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্য-প্রতিভা ও নাট্যকৃতির বিকাশ পরম্পরা-আশ্রয়ী ও স্তরবাহিক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম নাটক *বহিপীর* (১৯৬০) তাঁর প্রথম উপন্যাস *লালসালু* (১৯৪৮) থেকে সাত বৎসরের ব্যবধানে প্রকাশিত। কিন্তু দুটি

রচনাতেই তিনি অভিন্ন প্রতিপাদ্যসহ উপস্থিত। এ দেশীয় সমাজ–চৈতন্যকে স্পর্শ করে ব্যক্তির অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার স্বরূপ অনুধ্যানই বহিপীর-এ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৌল প্রেরণা। বস্তুত, বহিপীরের মাধ্যমে এ দেশীয় ধর্মসম্পৃক্ত ব্যক্তি, পীর-দরবেশ-খাদেমদের অন্তর্গত চারিত্রিক অসঙ্গতি, তাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও লিবিডো চেতনার রূপাঙ্কন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আপাত অনিষ্ট বলে মনে হলেও তাঁর অভিপ্রায় অধিকতর গভীর আর তা অভিব্যক্ত হয়েছে তাহেরা–হাশেম আলীর আচরণে ও সংলাপে। তাদের পুনর্জাগরণ এবং দায়িত্বের দায়ভার বহন করে নিজেদের শুদ্ধ সত্তায় (অথেনটিক বিং) সুস্থির হওয়ার মধ্য দিয়েই এ নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনবিবেচনা হয়েছে রূপাঙ্কিত।

বহিপীর-এ প্রথাশ্রয়ী পঞ্চাঙ্ক নাটকের গঠনরীতি অনুসরিত হয়নি। একাঙ্ক নাটকের ঐক্য–সংহতিও এ নাটকে অনুপস্থিত। সে-ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা যায় সময় বিভাজন ও মঞ্চ-পরিকল্পনার অভিনবত্ব। বহিপীর-এর বিস্তার নদীতে ভাসমান একটি বজরার দুটি কামরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর এ নাটকে আশ্রিত সময়ের পরিধি মাত্র বার ঘন্টা। দুটি অঙ্ক-বিভাগ থাকলেও বহিপীর-এ কোনো দৃশ্য-বিভাজন নেই, কিন্তু সে-অভাব পূরণ করেছে নাট্যকারের বর্ণনা। প্রতিটি চরিত্রকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপনের পূর্বেই নাট্যকার চরিত্র–বিশেষের ব্যক্তিস্বরূপ, মঞ্চে তাদের অবস্থান, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, এমনকি মঞ্চে আলো-ছায়ার ব্যবহার পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন।

বহিপীর-এর সংলাপ নাটকটির চরিত্রসমূহ, পাত্র-পাত্রীদের জীবনার্থ, তাদের সংকট ও স্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক। তাহেরা, বহিপীর, হাতেম আলী, হাশেম আলী, খোদেজা, এমনকি হকিকুল্লাহ্‌কে পর্যন্ত আমরা স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারি। তাদের মুখনিঃসৃত সংলাপই তাদেরকে পৃথকভাবে ও নিজস্ব কণ্ঠস্বরে পরিচিত করেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় নাটক *তরঙ্গভঙ্গ* (আষাঢ় ১৩৭১/১৯৬৪) *বহিপীর* থেকে অধিক শিল্পশুদ্ধ, আধুনিক ইয়োরোপীয় নাট্য-আন্দোলন চিন্তার সন্নিপাতে উজ্জ্বল। বক্তব্যগত বিবেচনায় *তরঙ্গভঙ্গ* তাঁর তৃতীয় উপন্যাস *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)-র সমধর্মী, দুঃসহ মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে ব্যক্তির অস্তিত্ববান হয়ে-ওঠার কথা।

তরঙ্গভঙ্গ–এর মৌল সংকট আমেনাকে আশ্রয় করেই হয়েছে ঘনীভূত। স্বামী ও সন্তান হত্যার অভিযোগে আমেনাকে আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরী অভিযুক্ত করেছে। ফলে আদালতে মামলা রুজু হয়েছে। সাক্ষি-সবুদ প্রস্তুত, বিচারকও

স্বকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি তিনি বিধান করতে পারেননি। ফলে বিচারক নিজেই আত্মহত্যা করেছেন। বস্তুত, ন্যায়-বিচারের অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও শর্তবন্দি সমাজব্যবস্থায় বিচারক তা বিধান করতে পারেননি। আর এই ব্যর্থতার যন্ত্রণা, অস্তিত্বের দায়ভার বহনে ব্যর্থ হয়েই তিনি অস্তিত্ব থেকে পলায়ন করেছেন।

তরঙ্গভঙ্গ-র কাহিনী ভগ্নক্রমিক, স্বামী ও সন্তান হত্যার অপরাধে আমেনার বিচারদৃশ্য উন্মোচনের সঙ্গেই এর শুরু। অতঃপর হত্যার ঘটনাদ্বয় উঠে এসেছে ফ্লাশ ব্যাকে, ভিখারিণী ও আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরীর সংলাপের মাধ্যমে। কাহিনীস্রোতে কালগত বিক্ষেপ-সৃষ্টির এ প্রবণতা ন্যাচারালিস্ট নাটকেরই সহজাত লক্ষণ। কিন্তু হত্যাদৃশ্যের বিবরণ থাকায় *তরঙ্গভঙ্গ* লাভ করেছে ভিন্ন অভিধা, প্রকাশবাদী পরিচয়।

মঞ্চ পরিকল্পনার দিক থেকেও *তরঙ্গভঙ্গ* *বহিপীর* থেকে আধুনিক। *বহিপীর*-এর মতো *তরঙ্গভঙ্গ*-এ দুটি অঙ্ক থাকলেও *বহিপীর*-এরদৃশ্য-বিভাজন এখানে নেই। *তরঙ্গভঙ্গ*-এর প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের 'শেষদৃশ্য' পরিকল্পনা বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। এই দুই দৃশ্যের পরিচয় প্রায় অভিন্ন। শেষদৃশ্যে কেবল চাপরাশি অনুপস্থিত। কিন্তু উল্লিখিত দুটি দৃশ্যের চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বরূপ গুণগতভাবে আলাদা, মৌলিকভাবে পৃথক। এই বৈলক্ষণই নির্দেশ করে যে, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে স্বপ্নে, জজের মনোলোকে, অবচেতনায়। আর এই স্বপ্ন-প্রসঙ্গই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইয়োনেস্‌কীয় নাট্যকৃতি, তুলে ধরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র যুগাতিক্রমী ও সমকালীন বিশ্বনাট্যের আঙ্গিক ও ঐতিহ্য-সচেতনা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় নাটক উজানে মৃত্যু (১৩৭০/১৯৬৩)-তে অ্যাবসার্ড রীতির শিল্পিত প্রয়োগ আমরা প্রত্যক্ষ করি। উজানে মৃত্যু যথার্থই বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি, অ্যাবসার্ডধর্মী বক্তব্য ও সে-অনুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণ, ব্যক্তির অবচেতনায় স্তরীভূত ভাব-অনুভাবের রূপকল্প রচনা, শব্দ ও নৈঃশব্দ্য এবং রূপক-প্রতীকের মেধাবী প্রয়োগ-সাফল্যে এক অনতিক্রান্ত নাটক।

৩

বিশ শতকের মানুষের জীবনে কোনো গল্প নেই। ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে সে নিয়ত একা। গভীর অনিকেত বোধ, অপার শূন্যতা চেতনাকে বহন করেই সে প্রাণ ধারণ

করে আছে, ভোগ করে চলেছে তারই পুনরাবৃত্ত জীবনের গ্লানি, দুঃখবোধ ও বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। *উজানে মৃত্যু* এই বিপন্ন মানব-চৈতন্যের কথাবস্তু, তাঁর শুভবোধশূন্য অন্তরানুভূতির কোলাজ। এ নাটকেও কোনো গল্প নেই। কোনো নায়ক চরিত্ররূপেও এখানে কাউকে দাঁড় করানো যায় না। *উজানে মৃত্যু* গল্পহীনদের গল্প, ঘটনাহীনদের বিচূর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের সমাহার, নৌকাবাহক, কালো ও শাদা পোশাক পরিহিতের দুর্ভার জীবনানুভূতির প্রতীতি।

'ধীর-স্থির দয়ালু বউ', তিন ছেলে, বেঁচে থাকার জন্যে উর্বর কিছু জমি—সবকিছুই নৌকাবাহকের ছিল। কিন্তু এখন তার জন্যে কোনো কিছুই অপেক্ষা করে নেই। সে এখন সর্বরিক্ত, কালের করাল গ্রাসে পতিত, এক পরাজিত ও বেদনাময় সত্তা। দীর্ঘশ্বসিত ও অতিমাত্রায় প্রলম্বিত জীবনের দায়ভার বহনের ক্ষমতাও তার নেই। সে তাই যেতে চায় এমন এক জগতে যা তার জন্যে যুগপৎ শান্তির ও স্বস্তির। আর সেই গন্তব্যে উপনীত হওয়ার জন্যেই তার নৌকা বাওয়া, উজানে যাত্রা। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি আনন্দকর ও স্বস্তিদায়ক স্থানের সন্ধান কখনওই মেলে না। নৌকাবাহকের যাত্রা সে-অর্থে অনন্তের উদ্দেশেই নিবেদিত, স্বনির্বাচিত মৃত্যুকে আহ্বান জানানোর জন্যেই নৌকাবাহকের দাঁড়টানা। বস্তুত, প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা যখন মানুষকে বিপর্যস্ত, ক্রমশ নিরস্তিত্ব ও নিমজ্জিত করে তখন বহমান সমাজচৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে অস্তিত্ব ঘোষণা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় অস্তিত্বকামী মানুষ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। ফলে তাকে যাত্রা করতে হয় সমাজ-স্রোতের বিরুদ্ধে, উজানে।

জীবনের গতি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হলেও সাধারণ ও লৌকিক সুস্থতা বোধের কোনো মানুষ কখনোই মৃত্যুর অভিলাষী হয় না। জীবনের সমার্থক হিসেবে, বেঁচে থাকার আনন্দের সমান্তরাল বলে মৃত্যুকে সেই ব্যক্তিই সহজে ও সোৎসাহে গ্রহণ করতে পারেন যার জীবনার্থের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মৃত্যুবীজ, গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো যে সর্বদা বহন করে চলেছে তারই পতনের বৈনাশিক উপাদান। বস্তুত, মৃত্যু একটি জীবনদর্শন, ব্যক্তির পরম প্রত্যয়। তাই মৃত্যু কখনোই ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ করে না। মৃত্যু ব্যক্তির অস্তিত্ব-অনুভবের অবভাস; বর্তমান জীবনকে অনুপমভাবে তার উপলব্ধিরই উপায়।[১] নৌকা বাহকের পরিণতির জন্যেও কেউ দায়ী নয়। নিজের সত্তার মধ্যেই লালন করেছে এক বৈনাশিক শক্তি, উইলিয়ম আই· অলিভার কথিত self-defeating complex।[২] অন্তরের শুদ্ধ চৈতন্য দিয়ে সে জেনেছে যে, তাকে 'কোথাও-না-কোথাও যেতে'-ই হবে, হয়ে উঠতে হবে অথেনটিক বিং। এ জন্যেই সে

উপভৌগিক জীবনাকাঙ্ক্ষা, গৃহী মানুষের নিরাপদ আশ্রয় থেকে স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্ন, অন্ধকারপ্রিয়, উৎকেন্দ্রিক ও পুনর্জাগরিত :

> অবশ্য ঘরেই থাকতে পারতাম। শান্ত-শিষ্ট একটি মেয়েকে আবার বিয়ে করতে পারতাম। তারপর অনেক ছেলেমেয়ে হতো। কিন্তু ওসব কিছু করিনি। তাতে কেবল পুনরাবৃত্তি হতো, এবং পুনরাবৃত্তির মতো সোজা জিনিস আর কিছু নাই। তাছাড়া জাঁক-জাঁকালো করে পুনরাবৃত্তি করলে তেমন নিদারুণ শোক-দুঃখও ডোবানো যায়। কিন্তু তবু আমি বেরিয়ে পড়ি। কারণ কেমন মনে হয়েছিলো, সেখানে কোথাও যেন ভুল আছে, কোথায় একটা ফাটল আছে, ...।[৩]

শাদা পোশাকপরিহিত ব্যক্তি নৌকাবাহকের সহযাত্রী ও বাল্যবন্ধু। তার প্রতিক্রিয়াও নৌকাবাহকের অনুরূপ। তার মতে, নৌকাবাহক যে-যাত্রা শুরু করেছে তা অব্যাহত রাখা, নির্ধারিত গন্তব্যে পৌছানোই তার কর্তব্য। আর এভাবে, স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমেই সে হবে পুনর্জাত, প্রতিস্থাপন করতে পারবে তার অস্তিত্বময় সত্তাকে।

কালো পোশাকপরিহিত ব্যক্তির অনুভূতি ও জীবনপ্রত্যয় শাদা পোশাকপরিহিত ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র। প্রথাবদ্ধ ও নিরস্তিত্বময় জীবনস্রোতে সমর্পিত হতেই সে অভ্যস্ত। তাই সারারাত নৌকা টেনে নৌকাবাহকের না-হলেও তার হয়েছে 'কাহিল অবস্থা।' নৌকাবাহকের উজানে যাত্রাকে সে ভয় পায়। বস্তুত, নরম্যান ফ্রেডরিক সিমসনের *অন ওয়ে পেনড্‌লাম* নাটকের মতোই *উজানে মৃত্যু*-র কালো পোশাকপরিহিত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সমাজবাস্তবতা, অনিশ্চয়তা-ভীতিতাড়িত ও নিমজ্জিত অস্তিত্ব মানুষের সত্তাস্বরূপ, তার সমাজ-অভ্যাসই আভাসিত হয়েছে।

আমাদের সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস-উন্মুখ হলে আমরাও ক্রমশ পাতিত হচ্ছি। এই চেতনা থেকে অ্যাবসার্ডের জন্ম বলে এর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নেই। অ্যাবসার্ডবাদীদের দ্বারা গৃহীত ও চর্চিত শিল্পপ্রকরণ, প্রক্রিয়াই এই নান্দনিক রীতির বৈশিষ্ট্য। আর সমগ্র জীবন ও সমাজসমস্যাকে আশ্রয় করা হয় বলে এই শিল্পচেতনার পরিধিও বহুবিস্তৃত। সমগ্র মানব অস্তিত্বই অ্যাবসার্ড জীবনাদর্শের সঙ্গে প্রসঙ্গবদ্ধ।[৪] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড রীতির প্রতি অনুরক্ত হলেও ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠ নন। বলা যায়, ইয়োরোপীয় সমাজসচেতনতা ও স্বদেশীয় সমাজকাঠামোর মধ্যে সমন্বয়, সংশ্লেষ সাধন, সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *উজানে মৃত্যু*-র অ্যাবসার্ড জগৎ।

বেকেট (১৯০৬-৮৯)-এলবি (জন্ম ১৯২৮)-র মতোই *উজানে মৃত্যু*-র চরিত্রদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ কোনো নাম দেননি। পূর্বসুরিদের প্রতিষ্ঠিত

ঐতিহ্যানুসারেই তিনি তাঁর চরিত্রদের কোনো পরিচয় উদ্ধৃত করেননি, নৌকাবাহক, শাদা পোশাকপরিহিত ব্যক্তি, কালো পোশাকপরিহিত ব্যক্তি— পরিচয়েই তারা নাটকে প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু তাদের আত্মোন্মোচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পূর্বসাদৃশ্য লক্ষণীয় নয়। শাদা পোশাকপরিহিত ব্যক্তির মাধ্যমেই কালো পোশাকপরিহিত ব্যক্তির অন্তর্গত স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে আর তাদের যৌথ সংলাপের মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়েছে নৌকাবাহকের জীবনার্থ :

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি। মেঘ যে কালো হয়ে আসছে আর শীতল হাওয়া যে ছুটেছে- সে-সব না দেখার ভান করছে আমার বন্ধু। কিন্তু সব কিছুই যে স্বাভাবিক সে-কথা প্রমাণ করবার জন্যে সে জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত আপনাকে বলেছি না যে, নদীতীর অদৃশ্য হয়ে গেলেও কল্পনার নতুন একটি নদীতীর সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার আছে। সহস্রবার ধ্বংস হয়ে গেলেও তার জন্যে সে নদীতীর অবিনশ্বর।

শাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।। (হতাশ হয়ে, আপন মনে) কি করি, কি করি এখন?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।। একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সে নৌকা ত্যাগ করবে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরে যাবে কিন্তু নিজের জগৎকে ধ্বংস করবে না।[৫]

উজানে মৃত্যু-র সংলাপ কার্যকারণহীন, বিষম কালচেতনার মধ্য দিয়ে বহমান চরিত্রসমূহের চেতনাপ্রবাহের ভাষ্য; তাদেরই কথামালার সমষ্টি। ফলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো অর্থপূর্ণ বক্তব্যের সন্ধান দেয় না :

নৌকাবাহক।। বুঝতে পেরেছি। সেও ঐ বাঁশবিদ্ধ মানুষের মতো। তিন-দিন তিন-রাত তার চারধারে দাঁড়িয়ে তার আত্মীয়-স্বজনরা কেঁদেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়েছিলো সব কিছুই অতি সাধারণ, সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। সে যদি কোথাও যাচ্ছিলো, তা সে তার আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থেই যাচ্ছিলো। বড় শান্তিতেই তার মৃত্যু হয়।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।। অন্য মানুষটাও শান্তিতে ডুবে মরেছিলো, কারণ, প্রতিবারই কোনো প্রকারে মাথা তুলতে পেরে যা সে দেখেছিলো তা সে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারে নাই। পানির অন্ধকারেও সে-দৃশ্য জ্বলজ্যান্ত থাকে। এবং কিছুই তার কাছে অসাধারণ মনে হয় নাই। আপনার বন্ধুও তেমনি। সবই তাঁর কাছে অতিশয় স্বাভাবিক। তাই আপনার ব্যবহার তাঁর কাছে একটু বেখাপ্পা ঠেকছে।

নৌকাবহক।। কিন্তু সে আমার সুবন্ধু, তার হৃদয়ও বড় কোমল। বস্তুত সে আমার সঙ্গে আছে বলে আমার ভালোই লাগছে। তাছাড়া একাকী নৌকাটি টানতে পারতাম না। মানুষ যতোই বলবান হোক, এমন কাজ একাকী করা সম্ভব নয়।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।। সে আপনাকে সাহায্য করবে বৈ কি। ভয়ানক ভূমিকম্পে নদীতীর অদৃশ্য হয়ে গেলেও সে আপনাকে সাহায্য করবে, কাল্পনিক নদীতীর দিয়ে আপনার জন্য হাল ধরবে। তার জন্য নদীতীর অদৃশ্য হওয়া কখনো সম্ভব নয়। বলবো আপনার দয়ালু সুবন্ধুটি আসলে কী?[৬]

উজানে মৃত্যু-তে অ্যাবসার্ডবাদীদের মতো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মঞ্চ সচেতনার পরিচয় আছে কিন্তু কোনো কষ্ট-কল্পনার স্থান নেই। লৌকিক পরিবেশকে ব্যবহার, পরিচিত দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর মঞ্চ সাজিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সজ্জিত মঞ্চ সে-বাস্তবতার সৃষ্টি ছাড়াও লোকাতীত, সাধারণ-উর্ধ্ব এক মনোবাস্তবতারই জন্ম দিয়েছে বলা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মঞ্চসজ্জা ন্যাচারালিস্ট রীতিশাসিত নয়, তা একান্তভাবেই অ্যাবসার্ডিস্ট পদ্ধতি-বিন্যস্ত। তাঁর *উজানে মৃত্যু*-র প্রকৃত মঞ্চ বাইরে নয়, দর্শক-পাঠকেব অন্তরে, তাদের মেধা ও অনুভূতিলোকেই এর অবস্থান :

> [উজ্জ্বল জোৎস্নাউদ্ভাসিত-মঞ্চ শূন্য এবং নিস্তব্ধ। শীঘ্র নেপথ্যে একটি মানুষের হাঁপানির আওয়াজ শোনা যায়। আওয়াজটি ক্রমশ উচ্চ হয়ে ওঠে। এবার অস্পষ্ট আলো দেখা দেয়। দিনাগমন শুরু হয়েছে। কিন্তু দৃশ্য এখনো পরিষ্কার নয়। তারপর বাঁ দিক থেকে আবছায়ার মধ্যে দিয়ে একটি মানুষ মঞ্চে প্রবেশ করে। তার পরনে কাছামারা লুঙি; তাছাড়া সম্পূর্ণ দেহ উলঙ্গ। সে দড়ি দিয়ে নৌকা টানে। নৌকাটি দেখা না-গেলেও একটি মানুষের জন্যে যে সেটি অতিশয় ভারি এবং সেটি যে লোকটি অনেকক্ষণ ধরে টানছে, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না।
>
> নৌকাবাহক মঞ্চের মাঝামাঝি পৌঁছলে আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবার দেখা যায় নদীতীর, মেঘশূন্য আকাশ, বিপরীত তীরের ক্ষীণরেখা এবং সেখানে একটা ছোট গ্রামের সামান্য আভাস।
>
> লোকটি এবার থামে। হাঁপাতে-হাঁপাতে সে অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই এধার-ওধার তাকিয়ে দেখে। তারপর দূরে কোথাও একটি উড়ন্ত পাখির ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। পাখিটিকে সে মনোযোগ দিয়ে দেখে।][৭]

এ মঞ্চে আছে অন্ধকার, শূন্যতা ও 'একটি মানুষের হাঁপানির আওয়াজ।' এই আলোকহীনতা কখনওই দূর হয়নি, চরিত্রের অবচেতনায় স্তরীভূত হয়ে বারবার তা ফিরে এসেছে :

> ১ [গানের শব্দ মিলিয়ে যায় এবং ডান দিক দিয়ে নৌকাবাহক বেরিয়ে যায়। তারপর মঞ্চ অন্ধকার হয়। অল্পক্ষণব্যাপী নীরবতার পর নৌকাবাহকের হাঁপানির আওয়াজ শোনা যায়। প্রথমে আস্তে, টিমাতালে। ক্রমশ সে-আওয়াজ জোরালো এবং দ্রুত হয়ে ওঠে।][৮]
>
> ২ [মঞ্চ আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ঝড়ের এবং নৌকাবাহকের শব্দ কতক্ষণ চলে। তারপর ঝড়ের শব্দ থেমে যায়।
>
> আবার আলো; আবার নৌকাবাহক এবং কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি বাঁ দিক দিয়ে মঞ্চে ঢোকে। নৌকাবাহকের অবস্থা বিশেষ কাহিল মনে হয়।][৯]

হাঁপানির আওয়াজ কখনও থামেনি, পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে তা লাভ করেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। এ আওয়াজ কেবলই নৌকাবাহকের বেদনাপ্রকাশক ধ্বনি

নয়; সভ্যতার, ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যূপবিদ্ধ মানুষের অবরুদ্ধ যন্ত্রণারও তা অভিব্যক্তি। বস্তুত, অন্ধকার, নৈঃশব্দ্য, কালো রঙের ব্যবহার ও হাঁপানির শ্রাব্যকল্পই *উজানে মৃত্যু*-র পরিবেশকে করেছে ঘনীভূত, বেদনানীল আর নাটকটিকে দান করেছে অ্যাবসার্ড চারিত্র।

৪

মঞ্চ-পরিকল্পনার বৈচিত্র্য এবং স্বদেশীয় সমাজ-কাঠামোর অন্তরালে আধুনিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বক্তব্য উপস্থাপন সত্ত্বেও *বহিপীর*-এ তিনি ছিলেন মূলত ন্যাচারালিস্ট। *তরঙ্গভঙ্গ*-এ সেই একই জীবনবোধে প্রত্যয়দৃঢ় হয়ে নাট্যকার হিসেবে তিনি এক্সপ্রেশনিস্ট। *উজানে মৃত্যু*-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পূর্বাপেক্ষা প্রাগ্রসর, বৈশ্বিক নাট্যকৃতিসচেতন, অ্যাবসার্ডিস্ট।

তথ্যনির্দেশ

১ ... death does not remain simple; it becomes mine. By being interiorized it is individualized. Death is no longer the great unknowable which limits the human; it is phenomenon of my personal life which maker of this life a unique life– that is, a life which does not begin again, a life in which one never recovers his stroke. Hence become responsible for my death as for my life.– Jean-Paul Sartre; *Being and Nothingness*. London: Matheun & co. Ltd. p 582

2 William, I. Oliver; October 1970, Between Abaurd and the Playwright : *Liteary Types and Themes*, New York : Hol, Renchont and winiston Inc, p 229

৩ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্- রচনাবলী (সৈয়দ আকরম হোসেন সংগৃহীত সম্পাদিত), দ্বিতীয় খন্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ ৫৩৩

৪ Esslin, Martin, Reprintesl in 1940, The Theatre of the Abaund, Englassl : Penguin Books, p 23-24

৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-রচনাবলী-২, পৃ ৫৩০

৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৬

৭ প্রাগুপ, পৃ ৫২১

৮ প্রাগুপ, পৃ ৫২৮

৯ প্রাগুপ, পৃ ৫৩১